

Liver Foundation Turns 20 Connecting Science and Society



Some journeys begin with a clear destination. Others begin simply with a conviction. Two decades ago, the Liver Foundation, West Bengal began as a modest effort to bring together science and society - to make medical knowledge meaningful to communities, and to make public health responsive to human realities. It was born from a belief that healthcare cannot exist in isolation from the lives, People live, the crises they endure, and the aspirations they hold. Over the years, this journey has taken many forms. It has unfolded in villages and towns, in classrooms and clinics, in moments of quiet education and in times of urgent humanitarian response.

From rural health initiatives to research and public engagement, from community awareness to institution building, the Foundation has sought to weave together compassion, knowledge, and collective action. Along the way, many hands have shaped this journey-community workers, physicians, researchers, volunteers, partner organisations, media colleagues, cultural ambassadors, and generous supporters.

Health inequities persist, new diseases emerge, and communities continue to navigate uncertainty. Yet the lessons of the past twenty years remind us that meaningful change is possible when science, society, and solidarity converge.

লিভার ফাউন্ডেশন এক প্রবাহ



ডাঃ কাজল চট্টোপাধ্যায়
LFWB

লিভার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে পথ চলার শুরু ঠিক কবে থেকে, তা ঠিক মনে নেই। ২০০৬ বা ২০০৭ সাল থেকে তো হবেই। এই সংগঠনের শুরুর আগে থেকেই আমরা বোধহয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম যে - মূলত গ্রামবাংলার মানুষের ভালোলাগা, মন্দলাগা, সুখ ও অসুখের সঙ্গে মনে মনে মেলাতে পারলে আমাদের মানসিক পুষ্টির সমৃদ্ধি ঘটবেই।

শুরুটা করেছিলাম সাতসকালে অভিদা (ডক্টর অভিজিৎ চৌধুরী আর সনাতনদের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামের মানুষের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে তা ল্যাবরেটরিতে পাঠানো দিয়ে। বিষয় ছিল - হেপাটাইটিস বি-এর মাত্রার গভীরতা নির্ধারণ করা। পরে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন EPI (Expanded Programme on Immunization)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বীজ বপন করতে পেরেছিলাম বলে তখন খুব আনন্দ হয়েছিল। এর পর যে আমরা গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবকদের মানোন্নয়নের প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করি। বীরভূম জেলার চারটি ব্লকের স্বাস্থ্য পরিষেবকদের নিয়ে শুরু হয় এই প্রশিক্ষণ। এই উদ্যোগকে আমার বেশ সাহসী এবং যুগোপযোগী বলে মনে হয়েছিল।

কেন সাহসী? কারণ ভারতবর্ষে এর আগে স্বাস্থ্য পরিষেবকদের নিয়ে কোনও কর্মসূচি কোনও রাজ্যেই কেউ করেনি। তবে ভালো-মন্দ মিশিয়ে সমালোচনা কিছুটা তো ছিলই। এর আগে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনও অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না, তাও আবার এই নতুন ধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের! যাদের বয়স আলাদা, শিক্ষার মান আলাদা এবং আচরণও ভিন্নতর। যাই হোক, নেমে পড়লাম প্রশিক্ষণ দিতে। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি! কখন যে ওদের ওপর আমাদের অধিকার জন্মালো, কখন যে ওদের 'স্যার' হয়ে গেলাম, কখন যে ওরা আমাদের আপনজন হয়ে উঠল বুঝতেই পারিনি। পরে রাজ্য সরকার এই প্রশিক্ষণকে অধিগ্রহণ করে। তবে এই প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি হয়েছে, তা ভোলার নয়। আজও ওদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আর বন্ধন অটুট।

পাশাপাশি আমরা ২০০৭ সালের শেষ নাগাদ ম্যাসাঞ্জোরে বিরসা মুন্ডার বন্ধ স্কুলের একটা অংশকে 'হেলথ ফেসিলিটি কাম ট্রেনিং সেন্টার' বানাই। বানানো সম্ভব হয় অবশ্যই স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায়। একবার আমরা জাপানি এনসেফালাইটিস (Japanese Encephalitis) টিকাকরণ কর্মসূচিতে ম্যাসাঞ্জোরে গিয়েছিলাম। সেই সময় ওখানকার মানুষের দুঃখ-কষ্ট আমাদের মনকে নাড়া দেয়। অভিদাকে বলতেই শুরু হয়ে গেল ওখানে আমাদের কাজকর্ম—ফ্রি ওপিডি ক্লিনিক আর স্বাস্থ্য পরিষেবকদের প্রশিক্ষণ।

প্রথমদিকে প্রায় সারা বছর সমস্ত বয়সের রোগীর ম্যালেরিয়া দেখতে পেতাম। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! পাশাপাশি চলত স্বাস্থ্য পরিষেবকদের প্রশিক্ষণ, যাতে সেখানকার মানুষগুলোর স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন ঘটানো যায়। এই সহজ-সরল মানুষদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার যে অনাবিল আনন্দ, তা বোধ হয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আজও সেই ক্লিনিক নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলছে। সবচেয়ে যেটা আমাকে নাড়া দেয়, সেটা হলো ফ্যান্ডিশেলি মুসালির ম্যাসাঞ্জোর নিয়ে আগ্রহ। খুব পছন্দ করতেন তিনি ম্যাসাঞ্জোরের এই কর্মকাণ্ড। আমাদের কাছে এই ছিল লিভার ফাউন্ডেশনের শৈশব। এর পরে এই প্রতিষ্ঠান ধারে ও ভারে অনেক ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

খুব মনে পড়ে করোনার সময়গুলো। করোনাকালে সমগ্র পৃথিবীই কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল আর বোধহয় কিছু স্বাভাবিক হবে না। ধাক্কা খেয়েছিল বুনিয়াদি শিক্ষা। অনেক জায়গায় (বীরভূম জেলার কথা আমি জানি) 'পড়ালেখা' প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে বাচ্চাদের শিক্ষা এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনেক জায়গায় আমরা গিয়ে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছি। আর একটি কর্মসূচির কথা বেশ মনে আছে - নিরন্নদের অন্নদান। সেই করোনাকালে নগরী গ্রাম ও তার চারপাশের গ্রামগুলোতে আমরা ঘুরে ঘুরে মানুষদের মধ্যে অন্ন বিতরণ করতাম।

বীরভূমের নগরীতে 'সরদীশ রায় স্মৃতি স্বাস্থ্য বিতান' আমাদের একটা ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান। সেখানে নিয়মিত রোগী দেখা, ছোট ছোট সার্জারি ও ফিজিওথেরাপিও করা হয়। ওখানে একটা খুব সুন্দর খুচরো ওষুধের দোকান আছে, যেটা সুন্দরভাবে চলে। এছাড়াও ওখানে 'সৃষ্টি'-র মতো প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে ছোটদের কিছুটা শিক্ষার এবং মানসিক ও শারীরিক বিকাশের প্রচেষ্টা চলছে।

হোম-বেসড প্যালিয়েটিভ কেয়ার আগেই শুরু করেছিলাম, তারপর অরুণ চৌধুরী ও প্রীতি চৌধুরীর বাসভবনটিকে 'অরুণ পরশ' নামে পাঁচ শয্যার প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেন্টারে পরিণত করা হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রীতি চৌধুরী তাদের বসতবাড়িটি এই কর্মকাণ্ডের জন্য সম্পূর্ণরূপে দান করেন। সেই প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেন্টার এখন খুব ভালোভাবে চলছে। এছাড়া সিউড়িতে অবস্থিত 'অরুণজ্যোতি পাঠাগার' বিভিন্ন মানুষের পড়াশোনার কৌতুহল তো বাড়িয়েছেই, তার ওপর খুব ভালো লাগে যখন টোটে করে 'বইওয়াল' বিভিন্ন গ্রামে বেরিয়ে পড়ে তার বইয়ের পসরা নিয়ে। বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব লিভার অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ সায়েন্সেস (আইআইএলডিএস) এবং জন সি মার্টিন লিভার গবেষণা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র (জেসিএমএলআরআই) গবেষণা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এর পাশাপাশি রয়েছে চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউট অব নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্স (সিআইএনএইচএস)। সময়ের সঙ্গে আরও সমৃদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের গর্ব লিভার ফাউন্ডেশন। ২০ বছরে পা দিয়ে আজ সে তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

রূপান্তরের দুই দশক ও প্রাপ্তির দু-দশক অভিজ্ঞতা ও জীবন-দর্শন



তুষার মণ্ডল
Project Coordinator, LFWB

লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের ২০ বছর পূর্তি শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ইতিহাস নয়, এটি মানবসেবা, সংগ্রাম এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এক জ্বলন্ত দলিল। এই দীর্ঘ পথচলার অর্ধেক সময়, অর্থাৎ এক দশক ধরে নিজেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রাখতে পেরে আমি গর্বিত। প্রতিষ্ঠানের দুই দশকের অর্জন এবং আমার কর্মজীবনের এক দশকের অভিজ্ঞতা যেন একসূত্রে গাঁথা। একটি অলাভজনক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ২০ বছর পূর্ণ করা নিছক কম কথা নয়! প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে টিকে থাকা, মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার টানা প্রচেষ্টার স্বীকৃতি এই ২০ বছরে পদার্পণ। গত দুই দশকে এই সংস্থা শুধুই প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দেশ-বিদেশে এক সুপরিচিত নাম হয়ে উঠেছে।

আমার কাছে এই দশ বছর কেবল একটি চাকরির সময় নয়, এ এক আত্মিক বন্ধনের রূপ পেয়েছে। এই সময়ে আমার পেশাগত দক্ষতা বেড়েছে। পাশাপাশি সমৃদ্ধ হয়েছে জীবনবোধ এবং মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। সংকটের মোকাবিলা করার মানসিকতা, কোনও কিছুতে নেতৃত্ব দেওয়া, সহকর্মীদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে পথ দেখানোর সুযোগ-সবই এই যাত্রার মূল্যবান প্রাপ্তি। কাজের পরিধি শুধু অফিসের চার দেওয়ালের মধ্যে নয়, ছড়িয়ে গিয়েছে দেশের নানা প্রান্তে। হিমাচল থেকে তামিলনাড়ু, গুজরাট থেকে আসাম-ত্রিপুরা কিংবা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল—বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার মানুষের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমাকে এক ভিন্ন ভারতকে চিনতে শিখিয়েছে। স্থানীয় কর্মীদের নেতৃত্ব দেওয়া, তাদের বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জগুলোকে কাছ থেকে বোঝা এবং সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও সফলভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। দুর্গম অঞ্চল, অপরিপািত পরিকাঠামোর সঙ্গে আরও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও স্থানীয় কর্মীদের নিষ্ঠা ও সহযোগিতায় আসা সাফল্য শিখিয়েছে - চ্যালেঞ্জ যত বড় হয়, সাফল্যের আনন্দও তত গভীর হয়। ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তাদের আবেগ, জীবনসংগ্রাম এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছে। যা আমাকে আরও পরিণত ও সমৃদ্ধ করেছে। প্রান্তিক মানুষের সরলতা, সীমিত সম্পদের মধ্যেও বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং কাজের প্রতি তাদের নিষ্ঠা জীবনের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। এই সব অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়েছে। উন্নয়ন শুধু পরিসংখ্যান বা প্রকল্পের সাফল্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানুষের জীবন বদলে দেওয়ার এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

দীর্ঘ এই যাত্রায় সবচেয়ে বড় শক্তি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রচলিত দূরত্বের পরিবর্তে তাঁরা সবসময় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের উৎসাহ, পরামর্শ এবং মানবিক আচরণ কর্মক্ষেত্রে একটি পরিবারের রূপ দিয়েছে। তাঁরা কখনও পদমর্যাদার ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করেননি। বরং কাজের মূল্যায়ন করেছেন নিষ্ঠা ও দক্ষতার ভিত্তিতে। ভুলত্রুটি শুধরে দেওয়া, সংকটে পাশে দাঁড়ানো এবং প্রতিনিয়ত শেখার সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁরা পুরো দলকেই এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছেন।



আজ পিছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, এই দশ বছর আমাকে শুধু একজন পেশাজীবী হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবেও সমৃদ্ধ করেছে। প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির হিসাবের বাইরে গিয়ে এই সময় আমাকে শিখিয়েছে মানুষের জন্য কাজ করার আনন্দ, দলগত প্রচেষ্টার শক্তি এবং সেবার প্রকৃত অর্থ। লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের ২০ বছর পূর্তি তাই শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের মাইলফলক নয়, এটি অসংখ্য মানুষের শ্রম, স্বপ্ন ও মানবসেবার প্রতি এক অঙ্গীকার। এই যাত্রার অংশ হতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ, গর্বিত এবং আশাবাদী।

Doing Science the Right Way



Ankita Chatterjee

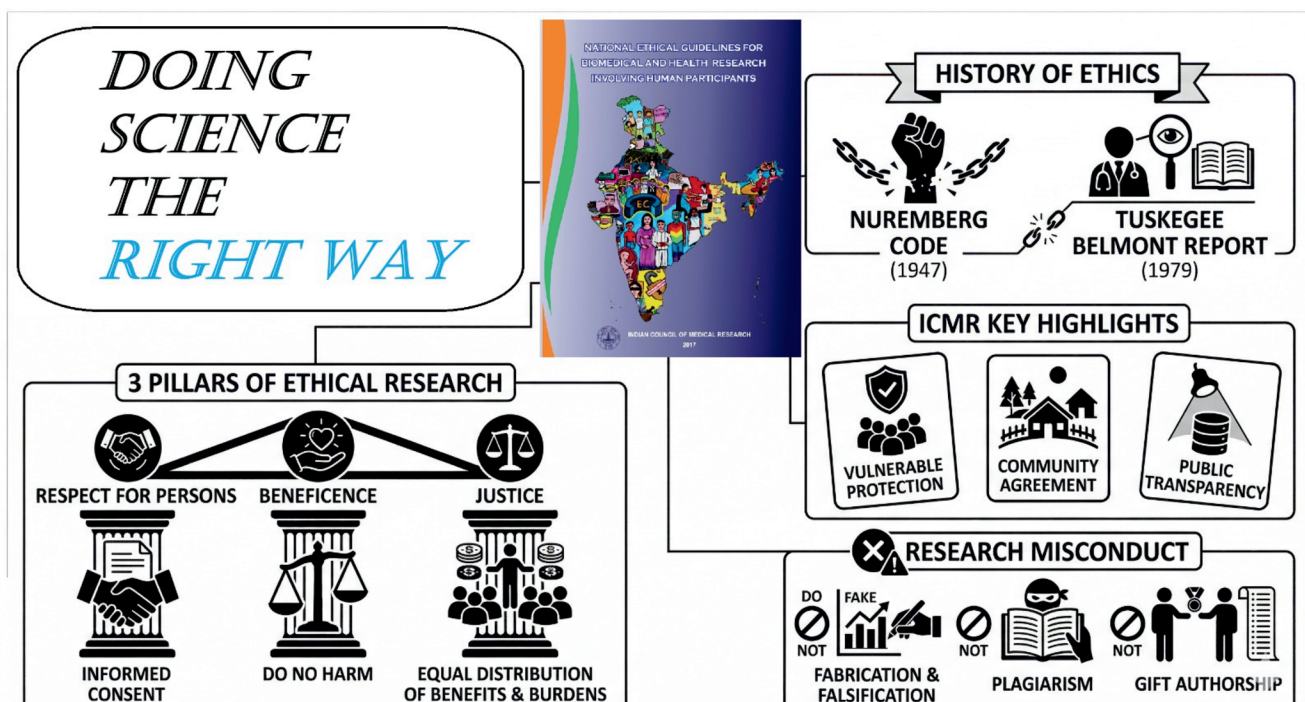
Assistant Professor, **JCMLRI**

Biomedical research has the power to cure diseases. But without morality, it can easily turn into a disaster. During the COVID-19 outbreak, we all have seen how ethical failures like (delays in reporting human-to-human transmission, scientific denials and global inequities in vaccine distribution) significantly accelerated disease spread. Ethical rules didn't appear out of nowhere – they were born from multiple such tragedies in our history. The Nuremberg Code was created after the Nuremberg Trials exposed horrific experiments done without consent during WWII. Later, the Tuskegee Syphilis Study—where treatment was withheld from Black men for decades—led to the Belmont Report which states that every human life be treated with absolute dignity. These tragedies forced the world to realize that 'science for the sake of

science' is dangerous and must never come at the cost of human dignity. In India, the Indian Council of Medical Research (ICMR) sets the gold standard for ethical practices. Their guidelines highlight that researchers must realize their social responsibility.

Every research participant must give 'informed consent' to the participation, after understanding the study in his native language. No secrets, no coercion, no surprises should be present. Researchers must focus on community improvement – must maximize benefits while keeping risks as low as possible. Every research must be registered publicly and maintain transparency. The non-negotiable and strict 'Do No Harm' rule highlights that the benefit to humanity must far outweigh the risk to the volunteer. Integrity is the bedrock of trust. Scientific misconduct, like faking data (fabrication), stealing ideas (plagiarism), 'gift authorship' or publishing in predatory journals without rigorous peer-review – all these in return destroy the trust towards research. Currently, there has been a spike in retractions of published papers. According to 2023-2024 data, the major causes of retractions were plagiarism, authorship issues, and data concerns. One of the reasons

could be that in India and many other countries, career advancement often depends on the number of publications, leading researchers to prioritize quantity over quality. We can always try finding justifications to the malpractices; however we must remember that science is a sacred trust—once broken, the damage can take decades to repair.



ঋত্বিক-যাপনের সপ্তম পর্ব: ডাঙনের মাঝে সৃজনের দীপশিখা



কিছু শিল্পী আছেন, যাঁরা কেবল তাঁদের সময়ের প্রতিনিধি নন, সময়কে অতিক্রম করা এক বিরল মানবিক চেতনার বাহক। ঋত্বিক ঘটক ও রামকিঙ্কর বেইজ তেমনই দুই শ্রষ্টা। একজন চলচ্চিত্রে, অন্যজন রং, রেখা ও ভাস্কর্যে মানুষের ভাঙন, বেদনা ও স্বপ্নকে রূপ দিয়েছেন।

৪ জুনের বিকেল। আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনকে মাথায় রেখা এদিনের ‘ঋত্বিক যাপন’-এর সপ্তম পর্ব খোলা প্রাঙ্গণ থেকে সরে এসে অনুষ্ঠিত হল সেই ঘরের ভিতরে, যেখানে একসময় ছিল গোয়ালঘর, গবাদি পশুর আশ্রয়স্থল। সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া সেই পরিসর যেন এদিন আরও একবার সাক্ষী থাকল স্মৃতি, শিল্প ও মানুষের মিলনমেলার।

অনুষ্ঠানের সূচনা করে লিভার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ড: পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেন ‘ঋত্বিক যাপন’-এর পূর্ববর্তী ছয়টি পর্বের নানা আলোচনার বিষয় ও অভিজ্ঞতা। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এটি কেবল এক চলচ্চিত্রকারকে স্মরণ করার আয়োজন নয়, বরং এক নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক অনুসন্ধান। এদিন প্রদর্শিত হয় ঋত্বিক ঘটকের নির্মিত রামকিঙ্কর বেইজ বিষয়ক তথ্যচিত্র। সেই চলচ্চিত্রে ধরা পড়ে শিল্পীর সৃজনী সত্তা, তাঁর একাকীত্ব, তাঁর নির্মাণের অন্তর্গত মানবিকতা। পাশাপাশি শোনানো হয় নবাবুণ ভট্টাচার্যের ঋত্বিক ঘটক-বিষয়ক এক মূল্যায়ন। নবাবুণের কণ্ঠে ঋত্বিক যেন আবার ফিরে আসেন—প্রতিষ্ঠানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক অদম্য শিল্পী হিসেবে।

এরপর বক্তব্য রাখতে এসে লিভার ফাউন্ডেশনের মেন্টর ডা. অভিজিৎ চৌধুরী স্মরণ করিয়ে দেন, কেন এই আয়োজনের নাম ‘ঋত্বিক যাপন’, ‘ঋত্বিক উদযাপন’ নয়। তাঁর মতে, ঋত্বিককে কেবল শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে দূরে সরিয়ে রাখার নয়, বরং প্রতিদিনের জীবনবোধ, প্রতিবাদ ও শিল্পচেতনার মধ্যে ধারণ করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি স্মরণ করেন নবাবুণ ভট্টাচার্যকে। অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত নবাবুণের রোগ-নির্ণয়ের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও তিনি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন।

আলোচনার অন্য পর্বে শিল্পী-গবেষক অনিন্দ্যকান্তি বিশ্বাস রামকিঙ্কর বেইজকে নতুনভাবে পাঠ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সমকালীন বাংলা শিল্পচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী, গবেষক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন ধরে রামকিঙ্করের শিল্প ও শিল্পদর্শন নিয়ে কাজ করে চলেছেন। তাঁর মতে, রামকিঙ্করকে কেবল আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত করলে তাঁর সৃষ্টিশীলতার ব্যাপ্তি ধরা পড়ে না। জল রং, প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্র এবং নানা পরীক্ষামূলক চিত্রভাষার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সমান প্রাসঙ্গিক ও নবতর। এই পর্বের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল রামকিঙ্কর বেইজ ও ঋত্বিক ঘটকের দুটি ভাস্কর্যের প্রদর্শন। অনিন্দ্য কান্তি বিশ্বাস সেগুলি সুদূর দিল্লি থেকে নিয়ে এসেছিলেন।



অন্যদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল কাফি তাঁর বক্তব্যে ঋত্বিক ঘটকের সুবর্ণরেখা চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে এক গভীর ও বহুমাত্রিক আলোচনার সূত্রপাত করেন। নবাবুণ ভট্টাচার্যের বক্তৃতা উল্লেখ করে তিনি নাগার্জুনের দর্শন এবং বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। সেই সূত্র ধরেই তিনি সুবর্ণরেখার পাঠে প্রবেশ করেন। আবদুল কাফি স্মরণ করিয়ে দেন যে সুবর্ণরেখা চলচ্চিত্রটি রাধেশ্যাম বুনবুনওয়ালা একটি কাহিনিকে অবলম্বন করে নির্মিত। চলচ্চিত্রের সূচনা লিপিতেই সেই উৎস কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক সেই আখ্যানকে নিজস্ব শিল্পদৃষ্টিতে সম্প্রসারিত ও রূপান্তরিত করেছিলেন; চিত্রনাট্যও ছিল তাঁরই রচনা। ফলে এটি কোনও কাহিনীর সরল রূপান্তর নয়, বরং এক স্বতন্ত্র শিল্পসৃষ্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। চলচ্চিত্রটির আলোচনা প্রসঙ্গে আবদুল কাফি অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের নিবাস গল্পের কথাও উল্লেখ করেন, যা সুবর্ণরেখার পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্ত জীবনের বেদনা ও স্থানচ্যুতির অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক পরিসরে এক গভীর মানবিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছিল।

তাঁর মতে, উভয় সৃষ্টির মধ্যেই দেশভাগ-উত্তর মানুষের ভাঙন, অনিশ্চয়তা এবং আশ্রয়হীনতার যন্ত্রণা ভিন্ন ভিন্ন শিল্পমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। আবদুল কাফির বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সুবর্ণরেখার চরিত্রবিন্যাস। তাঁর পর্যবেক্ষণে, চলচ্চিত্রটির প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে রামায়ণ-এর চরিত্রসমূহের প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায়। তবে ঋত্বিক ঘটক তাঁদের পৌরাণিক আবহ থেকে সরিয়ে এনে ইতিহাসবদ্ধ আধুনিক সময়ের বাস্তবতার মধ্যে স্থাপন করেছেন। ফলে চরিত্রগুলি একদিকে পুরাণের স্মৃতি বহন করে, অন্যদিকে উদ্বাস্ত মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠে। স্থান ও কালের এই রূপান্তরের মধ্য দিয়েই ঋত্বিক ঘটক পুরাণকে সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে এক অনন্য শিল্পভাষা নির্মাণ করেছেন।

অনুষ্ঠানের অন্তিম মুহূর্তে লিভার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ডা. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পর্দা নামল সপ্তম পর্বের, কিন্তু রামকিঙ্কর, ঋত্বিক ও নবাবুণকে ঘিরে যে চিন্তার দীপশিখা জ্বলে উঠল, তার আলো বহমান রইল ‘ঋত্বিক-যাপন’-এর আগামী পথচলায়।





আই আই এল ডি এস এর যত্নে বেড়ে ওঠা

ডানায় ডর



ছবিঃ শুভরিক চট্টোপাধ্যায়
Manager, Maintenance, IILDS

বৃষ্টি



মণিদীপা কুণ্ডু
Executive, OPD, IILDS

চেয়েছিলাম বসন্তের শেষ রেশটুকু মুছে দিয়ে,
প্রথম বৃষ্টির পবিত্র কণা হয়ে তুমি নামবে ধরায়।
তপ্ত মাটির সৌন্দর্য গন্ধে আমি শুধু তোমাকেই খুঁজব,
যেমন করে চাতক চেয়ে থাকে মেঘের-মায়ায়....

আবার জন্ম নিলে পাখি হতে চাই।
মুক্ত আকাশে উড়ে উড়ে সমগ্র সৃষ্টি
ঘুরতে চাই।
প্রাণ খুলে বাঁচতে চাই।
মানুষ হয়ে বাঁচতে গিয়ে আমরা কত কিছু হারিয়ে ফেলি।
নিজের ইচ্ছে।
নিজের সময়।
নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার।
তাই তো পাখি হতে চাই।



ফিল্ড ভিজিটের পথে পাওয়া এক মুঠো স্বস্তি
সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়
Documentation Officer, LFWB

বর্ষার পুরুলিয়া